উজানবেলা

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

(ছোটগল্প)

ফোনটা এল মাঝরাতে।

প্রায় দেড়টা নাগাদ।

গভীর নিশীথে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলে কার না বুক কাঁপে! নিঝুম অন্ধকারে ওই ধাতব ঝংকার বিশ্রী এক আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয় না কি? মনে তো হয়ই, এই বুঝি কোনও দুঃসংবাদ এল! মৈনাকের আগে আমিই ধড়মড়িয়ে উঠেছি বিছানা ছেড়ে।

গিয়ে রিসিভার তুলতেই ওপারে পুলুর গলা_ অ্যাই দিদি, মা কী সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে রে! পুলুর স্বরে বিপন্নতা, তবে তেমন মারাত্মক কিছু নয়। তবু ধুকপুকুনিটা যেন কমল না। ইদানীং মাকে নিয়ে ভারি দুশ্চিন্তায় থাকি।

বয়স আশি পেরিয়েছে, চোখে ভাল ঠাহর পায় না, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রায় বিকল, নানা আধিব্যাধিও ভর করেছে শরীরে, তবু নিজেকে কণামাত্র অথর্ব ভাবতে মা রাজি নয়। পেরে উঠুক না উঠুক, সংসারের সব কাজে হাত লাগাতে যাবে, পইপই করে বলা সত্ত্বেও রাতবিরেতে বাথরুম যাওয়ার সময়ে কাউকে ডাকবে না, একাই হুটহাট প্রতিবেশীদের বাড়ি চলে যাচ্ছে...।

বিপত্তিও ঘটে মাঝেসাঝে।
এই তো মাস খানেক আগে একটা বড়সড় কেলেঙ্কারি বাধাল।
কোনও প্রয়োজন ছিল না,
সরস্বতীর মা আসেনি বলে নিজেই ওপরপড়া হয়ে জলের বালতি টানতে গিয়ে,
মুখ থুবড়ে পড়ে,
নাকমুখ ফুলিয়ে ঢোল।
কপাল ভাল, মাথায় চোট লাগেনি। অ্যান্টিবায়োটিক আর পেনকিলারের কল্যাণে ব্যাপারটা সামলেছে বটে, কিন্তু আমাদের উৎকণ্ঠার পারা তো চড়েছে খানিকটা। উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে মার? কী করেছে?
_দ্যাখ না, রাতদুপুরে হঠাৎ আলমারি থেকে জামাকাপড় নামিয়ে এখন সুটকেস গোছাতে বসেছে।
_সে কী রে? কেন?
_কাল নাকি ভোর ভোর বেরতে হবে! বাবার সঙ্গে সাউথ ইন্ডিয়া বেড়াতে যাচ্ছে!
_কী সর্বনাশ! হঠাৎ বাবা...?
_জানি না। বুঝতে পারছি না।
_আজ ঘুমের ওষুধ পড়েনি?
_হ্যাঁ। দেওয়া হয়েছিল।
ইন ফ্যাক্ট, আমি যখন সাড়ে দশটায় ফিরলাম, তখন তো শুয়ে পড়েছে।... তারপর এই খানিকক্ষণ আগে হঠাৎ জেগে উঠে, আলোটালো জ্বালিয়ে...।

পুলু একটুক্ষণ থেমে থেকে বলল, কী করি বল দেখি? মাকে তো আর শোওয়ানো যাচ্ছে না। কেমন যেন একটা ট্রান্সে চলে গেছে রে! চিন্তায় পড়ে গেলাম। কী চলছে মার মধ্যে কে জানে, তবে মা যা জিদ্দি টাইপ, তাকে বাগে আনা সোজা কাজ নয়।

পুলু তো পারবেই না, একটুতেই যা ঘাবড়ে যায়। এরপর মা যদি স্যুটকেস হাতে হাঁটা লাগায়, পুলু হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যাবে।
আর নীলুর বউ? তার তো মাকে কবজা করার ক্ষমতাই নেই। দশ বছর আগে বাস অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে নীলু, তার পর থেকে শ্বাশুড়ি-বউয়ের সম্পর্কটা কেমন ঘাঁটা ঘাঁটা। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, দুটো পাল্লাই সমান সমান।

শিপ্রার কথা মা থোড়াই শুনবে। একমাত্র তুলতুলি যদি বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাকুরমাকে ঠাণ্ডা করতে পারে। আমিই চলে যাব? কিন্তু এত রাতে সালকিয়া থেকে টালিগঞ্জ ছোটা কি মুখের কথা? ট্যাক্সি মিলবে কি? নাহ্ সাতপাঁচ ভেবে লাভ নেই।

গলা ঝেড়ে বললাম,
_ডক্টর সেনগুপ্তকে একবার ফোন কর না।
_এখন? রাত দুটোয়?
_আহা, এমারজেন্সি কেস তো। জিজ্ঞেস কর কোনও ওষুধ-টষুধ আছে কিনা, যাতে চট করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়।
_হুম, সেটুকু হলেও তো আপাতত... টেলিফোন রেখে ভার বুকে বসে আছি। মৈনাকও জেগে গেছে, সব শুনে সেও বেশ ভাবিত। টিউবলাইটটা জ্বেলে ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ ধোঁয়া দিল বুদ্ধির গোড়ায়। তারপর ভুরু কুঁচকে রায়, সেনিলিটি।

পুরোপুরি মানতে পারলাম না। মার যে খানিক ভীমরতি ধরেছে, এ তো আমরা সবাই জানি। বেশি বকবক করে, এক কথা বারবার বলে, বহু সময়েই খেয়ে ভুলে যায়...। চোখে না দেখুক, কানে না শুনুক, দিনে অন্তত বারচারেক টিভির খবরের সামনে বসা চাইই চাই। তুলতুলির সঙ্গে তো রোজ এই নিয়ে লাগছে। সে বেচারা হয়তো নাচাগানা দেখছে, মা খটাস চ্যানেল ঘুরিয়ে টিভির ডগায় চোখ লাগিয়ে বসে গেল।

বাচ্চাদের মতো আইসক্রিম, চিপস, আর কোল্ড ড্রিংকসের দিকে ঝোঁক হয়েছে খুব। লজেন্স, চকোলেট পেলে তা মহা আহ্লাদিত, বাঁধানো দাঁতে কচর কচর চিবোচ্ছে। কিন্তু আজকের কীর্তিটাকে কি একই পঙ্‌ক্তিতে ফেলা যায়?

বাবা চলে গেছে আজ আঠারো বছর।
বাবার প্রসঙ্গ মা আজকাল তোলেও না বড় একটা,
অথচ হঠাৎ মধ্যরাতে সেই বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার সাধ জাগল কেন?
রিটায়ার করার পর মাকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ঘুরতে গিয়েছিল বাবা, সেই স্মৃতিই কি স্বপ্নে এসে নাড়িয়ে দিল মাকে? ঘুমের ঘোরেই হয়তো করছে ওসব কাণ্ড।

কিন্তু সেই ঘোরই বা কাটে না কেন? হলটা কী? তা যাই হোক, রাতে অবশ্য অশান্তি আর বাড়ল না। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ফের পুলুর ফোন, ডাক্তারবাবু ওষুধ দিয়েছেন, বেরিয়ে কিনেও এনেছে পুলু, কয়েক ফোঁটা খাইয়ে দিয়ে শুয়েও পড়েছে মা।

সকালে খবর নিলাম, মা তখনও আচ্ছন্নের মতো ঘুমোচ্ছে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে রওনা দিলাম টালিগঞ্জ। গিয়ে দেখি মা তখন বাইরের ঘরের সোফায়। চোখ ঈষৎ ঢুলুঢুলু। পাশে গিয়ে বসেছি। মাকে আর এক প্রস্থ নিরীক্ষণ করে বললাম, বাহ্ ম্যাডাম তো ফিট। মা যেন কথাটা ঠিক বুঝল না। হাসি হাসি মুখে তাকাল শুধু।

চোখ টিপে বললাম, জব্বর একটা খেল দেখালে বটে। এবারও কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। উল্টে বলল, ফোন করে এলি না তো আজ? স্বর বেশ নিস্তেজ। শিপ্রাকে জিজ্ঞেস করলাম, কখন ঘুম থেকে উঠেছে?
_এই তো, বারোটা, সাড়ে বারোটায়।
_স্নান করেছে?
_করতে চাইলেন না। খাওয়ার আগে মাথাটা ধুইয়ে দিয়েছি। শিপ্রা গলা নামাল, জানো তো, কালকের কথা মা বেমালুম ভুলে গেছে।
_তাই নাকি? ডাক্তার বাবুকে জানিয়েছিস?
_ উনি তো এসে দেখে গেলেন। বললেন, রক্তটা টেস্ট করাতে। সোডিয়াম পটাশিয়ামের ব্যালেন্সের গণ্ডগোল থেকেও নাকি এমনটা হয়ে থাকে। চিন্তা যেন বেড়েই গেল খানিকটা। নিজেকে প্রফুল্ল রাখার জন্য মাকে নিয়ে পড়েছি। গলা উঠিয়ে বললাম, তোমার কেসটা কী বল তো? হঠাৎ আবার সাউথ ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য খেপে উঠলে কেন?
_আমি? মা চোখ পিটপিট করছে, কই, না তো।
_বললে মানব? কাল ব্যাগ স্যুটকেস নিয়ে রেডি ...?
মার তাও কিছুই স্মরণে আসে না।
ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে। হাতে হাত রেখে বললাম, সঙ্গী হিসেবে আমাদের কাউকে মনে ধরল না? বাবাকে ওপর থেকে টানাটানি শুরু করেছ?

আমরা কি তোমায় দক্ষিণ ভারত নিয়ে যেতে পারি না?

মা এবার কী শুনল কে জানে, গাল দুটো হাসিতে ভরে গেল সহসা। জ্বলজ্বলে চোখে বলল, একটা ভারি মজা হয়েছে, জানিস।

ওই যে একটা জায়গা আছে ...

যেখানে অনেকটা উঁচুতে উঠে পাখিদের খাওয়াতে হয় ... হ্যাঁ হ্যাঁ,

নামটা মনে পড়েছে ... পক্ষীতীর্থম্।

কী গোবদা গোবদা সিঁড়ি ওখানে, বাব্বাহ। অর্ধেক চড়েই আমার দম শেষ, সিঁড়িতে বসে পড়েছি। ... এদিকে তোর বাবা তো উঠে গেছে টকাটক। পাহাড়ে মাথায় পেঁৗছে বাবুর খেয়াল হল, বউ তো সঙ্গে নেই। অমনি তিনি ধরে নিলেন, আমি হারিয়ে গেছি।

তারপর তো খুঁজছে পাগলের মতো। পাশ দিয়ে গটগট নেমে গেল ... আমি ডাকছি ... সে শুনতেই পেল না। পরে কী বলে জানিস? আমার ডাকাডাকি শুনে ভেবেছিল, ভিখিরি পয়সা চাইছে! এ গল্প বহুবার শোনা। তবে আজ যেন মার বলার ভঙ্গি একটু অন্যরকম। যেন ঘটনাটা আজ-কালের মধ্যেই ঘটেছে। যেন এই মুহূর্তে মা দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

মা ফের বলল, এরপর তো পুরীতে আর এক কেচ্ছা। আমি তো কিছুতেই সমুদ্রে নামব না ... ওই জল, ওই ঢেউ ... শাড়ি-টাড়ি সব মাথায় উঠে যায় ... এদিকে তোর বাবাও ছাড়বে না, বলে কিনা আমার আন্ডারওয়্যার পরে নামো!

শেষে তার কথামতো... হাজারো বাবার শোনানো গল্পে নতুন করে ডুবে যাচ্ছে মা। জড়ানো স্বর চড়ছে, নামছে। কখনও মুখে ফিকফিক হাসি, কখনও চোখ খুশিতে চিকচিক। সারাটা বিকেল এভাবেই স্মৃতিরোমন্থনে মশগুল রইল মা। কিন্তু বাবা যে নেই, তা নিয়ে একবারের জন্যও কোনও আক্ষেপোক্তি শোনা গেল না। পরদিন রক্ত পরীক্ষা হয়ে গেল।

ডাক্তারবাবুর অনুমানই ঠিক, রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ একটু কমের দিকে। তবে ভয়ের কিছু নেই, নুন খাওয়ার মাত্রাটা সামান্য বাড়ালেই চলবে। কী আশ্চর্য, মাত্র সাত দিনে মা পুরো স্বাভাবিক। অর্থাৎ ফিরে গেছে পুরনো ফর্মে। ছেলেমানুষি আর বকর বকর তো চলছেই, হুটহাট হাজির হচ্ছে রান্নাঘরে, আবছা চোখে কড়াইর ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ে, মুখরোচক খানা বানাচ্ছে পুলু আর তুলতুলির জন্য।

আবার আমার আঁটি চাকলা ভাগাভাগি নিয়ে তাদের সঙ্গে ঝগড়াও চলছে সকাল বিকেল। রাতে ঘুমোচ্ছে দিব্যি। পুরনো ঘুমের ওষুধেই। আমরাও মোটামুটি স্বস্তিতে। আগের মতোই হাসাহাসি করি মার কাণ্ডকারখানা দেখে।

মায়াও জাগে অবশ্য। জানি তো, ভীমরতি মাকে এমনি এমনি ধরেনি। আহা রে কম শোকতাপ পেয়েছে মা! বাবারই কি মৃত্যুর বয়স হয়েছিল?

প্রাণবন্ত মানুষটা প্রায় বিনা নোটিসে, মাত্র ছেষট্টিতে ...।

নীলুর বেঘোরে প্রাণ হারানো তো মেনেই নেওয়া যায় না।

মায়ের কাছে ওই পুত্রশোক যে কী মর্মান্তিক!

তারপর মার থেকে দশ বছরের ছোট মাসিমণি তো প্রায় মার হাতের ওপরেই মারা গেল। সে আঘাতও কম বাজায়নি মাকে। এছাড়া একের পর এক ভাসুর, দেওর, ননদ, জলজ্যান্ত দুই ভাসুরপো, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে নিজের তিন ভাই, দুই ভাজ, ভগ্নিপতি ...।

মৃত্যুর এই মহামিছিল তো মস্তিষ্কের কোষগুলোকে মাড়িয়ে দিয়ে যাবেই। এতকিছুর পরও মা যে হাসছে, গল্প করছে, রান্না করতে চাইছে, এগুলো তো আমাদের উপরি পাওয়া। এই নিশ্চিন্ততা অবশ্য বেশিদিন টিকল না। মাস দেড়েকও যায়নি, হঠাৎ এক রোবাবার দুপুরে তুলতুলির ফোন, ও পিসি, এক্ষুনি চলে এসো।

_কেন রে?

_ঠাম্মা আবার সেই আগের বারের মতো করছে!

_বলিস কী রে? আবার স্যুটকেস গোছাচ্ছে?

_না গো। ভাত খেয়ে উঠেই সাজতে বসে গেছে। ড্রেসিংটেবিলের সামনে। চুল বাঁধছে, পাউডার মাখছে, চুল বাঁধা পছন্দ হল না, আবার খুলে খোঁপা করছে ...

_ কেনওও?

_এক্ষুনি নাকি ইভনিং শো শুরু হয়ে যাবে।

_কীসের শো?

_'পথে হল দেরি'। উত্তম-সুচিত্রার। দাদু নাকি বিজলীর সামনে অপেক্ষা করবে।

_সর্বনাশ! পুলু কোথায়?

_কাকামণি তো ভোরবেলা শান্তিনিকেতন গেল। কাল ফিরবে।

_খেয়েছে রে। ... চোখে চোখে রাখ, যেন বেরিয়ে না যায়।

_ওই ওষুধটা দিয়ে দেব? এখনও রাখা আছে। দু-এক সেকেন্ড থমকে থেকে বললাম, থাক। আমরা এক্ষুনি যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটে তৈরি হয়ে ছুট। সঙ্গে মৈনাক। হাঁচোড় পাঁচোড় করে টালিগঞ্জ পেঁৗছে দুরু দুরু বুকে নামলাম ট্যাক্সি থেকে।

ভেতরে ঢুকে দেখি, সে এক দৃশ্য! মা খাটে পা ছড়িয়ে বসে। দু'দিকে পাহারাদারের মতো দাঁড়িয়ে তুলতুলি আর শিপ্রা। মার পরনে বহুকাল আগের এক রঙিন ব্যাঙ্গালোর সিল্ক, কপালে ঘাড়ে গলায় ছোপ ছোপ পাউডার। মুখ বেজায় গোমড়া, কব্জি চোখের কাছে এনে ঘড়ি দেখছে ঘন ঘন। হতবাক মুখে বলল, এ কী অবস্থা! শিপ্রা বলল, তাও তো এখন অনেকটা দমানো গেছে। ভাগ্যিস তুলতুলি নুনচিনির জলটা খাওয়াতে পেরেছিল, নইলে এতক্ষণ রোখা যেত না। মা যেন প্রথমটা আমাদের খেয়াল করেনি।

হঠাৎ আমার দিকে নজর যেতে গাল ফুলিয়ে বলে উঠল, ও ঝুনু দ্যাখ না, মা-মেয়ে আমায় জোর করে আটকে রেখেছে। তোর বাবা ওই দিকে রেগে যাবে না? কথাটা ঝাং করে বুকে ধাক্কা মারল। ক্ষণিকের জন্য ভুলে গেলাম, মা এখন স্বাভাবিক নয়। মনে হল, পাল্টা ধাক্কা দিয়ে মা-র অলীক জগৎটাকে ভেঙে দেওয়া দরকার।

কড়া গলায় বললাম, কী আবোল তাবোল বকছ? জানো না, বাবা নেই?
_বললেই হল? আমার সঙ্গে কথা হয়েছে সে টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে থাকবে ...
_না। বাবা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে না। বাবা মারা গেছে। অবাক কাণ্ড, রূঢ় সত্যিটা শুনেও মার মুখে কোনও ভাঙচুর হল না। একটুক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল। তারপর ঠোঁটে এক অনাবিল হাসি।

অবিকল অনেক অনেক বছর আগের মতো মা গ্রীবা হেলিয়ে বলল, জানতাম ঝোলাবে। 'হারানো সুর'-এর দিনও এমনটাই করেছিল।
পরে ওজর গাইল, বন্ধুরা নাকি আটকে রেখেছিল আড্ডায়।
আমি যেন কিছু বুঝি না? আচমকাই গলা খাদে নামিয়েছে মা।
প্রায় ফিসফিস করে বলল,
আসলে তোর বাবা উত্তম কুমারকে ভীষণ হিংসে করে। আমরা স্তম্ভিত। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। মা হাসিটাকে আর একটু বিছিয়ে দিয়ে বলল, কিছু হিংসুটে মানুষ বটে তোর বাবা। পাছে আমি উত্তমে মজে যাই, কিছুতেই তার বই দেখাবে না। নেহাত আমার সঙ্গে পেরে ওঠে না...। আমার বাপু সাফ কথা,
তুমি সুচিত্রাকে প্যাটপ্যাট করে গিলতে পার,
আমার উত্তমকে পছন্দ হলেই দোষ?
মৈনাক ভ্রূ কুঁচকে শুনছিল।
কানের কাছে মুখ এনে বলল, ডাক্তার বাবুকে ফোন করব? অস্থির অস্থির লাগছিল আমার। ঝেঁঝে উঠে বললাম, জিজ্ঞাসার কী আছে?
শিপ্রার কাছ থেকে নম্বরটা নাও, মোবাইলে ট্রাই করো।
মৈনাক ও শিপ্রা চলে গেল পাশের ঘরে।

মা কিন্তু থেমে নেই, আপন মনে বলে চলেছে, শুধু উত্তমকুমারই বা বলি কেন, কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে আমি হেসে দুটো কথা বললেই তো তার জ্বলুনি।

রমেশবাবুর সঙ্গে কী ব্যবহারটা করে বল?

বেচারার বউ মরে গেছে, মাঝে মাঝে আমার হাতের মোচাটা লাউটা খেতে আসে, তাতেও বাবুর কী রাগ! বলতে বলতে মিটিমিটি হাসছে, সেদিন কী কাণ্ডটাই না করল... লজ্জায় মরে যাই!

রমেশবাবু ভেতর বারান্দায় বসে আয়েস করে কচুর শাক খাচ্ছে,

অমনি কোত্থেকে তোর বাবা হাজির।

কোমরে হাত রেখে দেখছে খাওয়া।

যেই না রমেশবাবু বলেছে, আপনার গিন্নির হাতে জাদু আছে মশাই, অমনি ভেংচে উঠল, কর্তার হাতে লাঠিও আছে স্যার!

বোঝ বোঝ কেমন একাষেঁড়ে ভালোবাসা! কথার প্লাবনের মাঝে মৈনাক ফিরেছে। বলল, ডাক্তারবাবু ওই মেডিসিনটাই আবার অ্যাপ্লাই করতে বললেন। সেম ডোজ। না ঘুমোলে পেসেন্ট কুল ডাউন করবে না।

-কিন্তু কেন আবার রোগটা ফিরল?

-সিম্পল।

সোডিয়াম লেভেল নিশ্চয়ই আবার ফল করেছে।

উনি তো আগের বারের ট্রিটমেন্টটাই টো টো চালিয়ে যেতে বললেন। রেগুলার সল্ট থেরাপি, আর ইমারজেন্সিতে ওই নার্ভের ওষুধ।

এতে ইমপ্রুভ না করলে নার্সিংহোমে ভর্তি করে স্যালাইন দিতে হবে। অত দূর অবশ্য গড়াল না সমস্যাটা।

চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ ভীমরতিতে ফিরে এলো মা। এবং যথারীতি সেদিনকার কীর্তিকলাপ মাথা থেকে উধাও।

তবে পুলু এবার যথেষ্ট সতর্ক।

বাড়িতে নির্দেশ জারি করেছে, মার নুন খাওয়া যেন কমানো না হয়।

আশি বছরেও মা যখন রক্তচাপ নিয়ে তেমন ভুগছে না, নুন একটু বেশি খেলে ক্ষতি কী!

সেই মতোই চলছিল।

গরম ফুরিয়ে বর্ষা এসে গেল হুড়মুড়িয়ে।

প্রথম কয়েক দিন তো নাজেহাল দশা।

সালকিয়া ভাসছে, গোলাবাড়িতে থই থই জল, জিটি রোড তো নদী।

মার কাছে যাওয়া হয় না নিয়মিত।
গেলে বেশিক্ষণ বসতে পারি না, আকাশ বেগতিক দেখলেই পালিয়ে আসি।
ফুচকার নেশা।
রোজ বিকেলে গুনে গুনে চারটে ফুচকা চাই।
কম হলে মুখ হাঁড়ি, বেশি হলে খাবে না।
ওই ফুচকাই নতুন করে বিপদ ডেকে আনল।

কী সব মসলা-টসলা দিয়েছিল কে জানে, কিংবা হয়তো তেঁতুলজলে গড়বড় ছিল, খেয়ে হঠাৎই মার পেট ছেড়েছে।

ওষুধ-টষুধ দিয়ে বাথরুম যাতায়াতটা বন্ধ করল পুলু; কিন্তু মা যেন ঝিমিয়ে পড়ল কেমন। কথাবার্তা বেশি বলে না, দিনভর শুয়েই থাকে।
ফোনে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালাই, কাজ হয় না বড় একটা পাপু বারবার বলছে, দিম্মাকে নিয়ে এবার পুজোয় দিল্লি চলে এসো মা, গাড়িতে আগ্রা-বৃন্দাবন-মথুরা ঘুরিয়ে দেব।

প্রিয় নাতির এমন সাদর আমন্ত্রণেও দিদিমা যেন উৎসাহী নয়, হুঁ-হ্যাঁ কিছুই বলে না। আমাদেরও সংশয় জাগছে, মা যেমন জবুথবু হয়ে পড়ছে আর কি কোথাও নড়ানো যাবে?
এমনই এক সময়ে একদিন সন্ধেয়,
পুলুর আর্তস্বর উড়ে এলো
_ মা তো আবার খেল দেখানো স্টার্ট করেছে রে দিদি।
একা বসে টিভি দেখছিলাম।
সিরিয়াল মাথায় উঠল।
ত্রস্ত সুরে বললাম, কী হলো এবার?
-বর এসে গেছে, এদিকে কনের সাজ এখনও হলো না... -সম্ভবত মা স্বয়ং। বাবা বিয়ে করতে এসেছে।
-যাহ্।
-হ্যাঁ রে। বাইরে নাকি খুব বৃষ্টি, বরযাত্রীরা ভিজে গেছে, তাদের শুকনো জামাকাপড় দেওয়া হলো কি-না জানতে চাইছে।
আরও শুনবি?
বলছে, মেজদাকে যেন খবরদার পিঁড়ি ধরতে দিস না, রোগা মানুষ... শুনতে শুনতে আচমকাই মস্তিষ্কে ইলেকট্রিক শক।
আজ বাবা-মার বিয়ের দিন না?

একুশে জুলাই!
কিছু মনে রাখতে পারে না মা, অথচ এই দিনটা স্মরণে রয়েছে?
এবং পিছোতে পিছোতে চলে গেছে সেই গোড়ায়?

পুলু করুণ গলায় বলল,
আমায় তো প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দিচ্ছে রে।
পেঁয়াজরঙা বেনারসিটা কোথায় জানতে চাইছে, কোথায় রতনচূড় রেখেছি, বিছেহার, টিকলি... আরও কী কী সব যেন...
-দেরি করছিস কেন? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনট্যাক্ট কর।
-ফোনে কথা হয়েছে। উনি বলছেন, ফ্লুয়িড লসের ইফেক্ট। তবে এবার আর বাড়িতে হবে না, নার্সিংহোমে, স্যালাইন চলবে, অবজারভেশনে রাখবে কয়েক দিন... -ও।

আমার তালু শুকিয়ে এলো। ঢোক গিলে বললাম, তাই কর তাহলে। যদি এতে মা সুস্থ হয়... -আমি ভুলিয়ে-ভালিয়ে মাকে নিয়ে যাচ্ছি।
হেলথ কেয়ারে।
তোরা যদি একবার আসিস... অনুরোধের প্রয়োজন ছিল না।
যেতে তো হবেই।
মৈনাক এখনও অফিসে, তাকে খবরটা দিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। নার্সিংহোমটা টালিগঞ্জে, ভিড় জ্যাম ঠেলে পেঁৗছলাম প্রায় আটটায়।

লাউঞ্জে পুলু আর তুলতুলি। হন্তদন্ত পায়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী রে এখন কেমন?
পুলু ঘাড় ঝুলিয়ে বসেছিল। শুকনো হেসে কাঁধ ঝাঁকালো, এমনি তো ঠিকই আছে। নো ফিজিক্যাল অসুবিধে।

-তোরা এখানে কেন? মার কাছে থাকতে দিচ্ছে না? তুলতুলি বলল, এতক্ষণ তো আমি ছিলাম। আমরা সামনে গেলেই যা উল্টোপাল্টা বকছে...।
বর দেখতে কেমন হলো, কোন বরযাত্রী একশ' আটটা রসগোল্লা খেয়েছে, কে জোরে জোরে বিয়ের কবিতা পড়ল...। বলতে বলতে হেসে ফেলেছে তুলতুলি, যাও না। দেখে এসো।

-অ্যালাউ করবে এখন? -হ্যাঁ হ্যাঁ, একজন তো থাকতেই পারে।
-ছোট্ট পরিচ্ছন্ন কেবিন। মা শুয়ে আছে শুভ্র শয্যায়। চোখ দুটো বোজা। ডান হাতের সবুজ শিরা বেয়ে লবণজল ঢুকছে শরীরে।

ফোঁটা ফোঁটা করে। টুল টেনে বিছানার পাশে বসলাম। নিঃশব্দে। মার কপালে হাত রেখেছি। চোখ খুলল মা। কুয়াশা মাখা দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল, কে? গীতা? এতক্ষণে তোর আসার সময় হলো? গীতামাসির খোঁজ করছে কী? মার জামালপুরের সেই বান্ধবী? তিনি তো বছর চারেক আগে মারা গেছেন! তাড়াতাড়ি বললাম, আমি ঝুনু। তোমার মেয়ে। পরিচয়টা যেন মাকে ছুঁতে পারল না। অস্ফুটে বলল, গীতা এলো না? বাসরে গান গাইবে বলছিল?

-মা প্লিজ। ঘুমানোর চেষ্টা কর তো।
-দূর বোকা, আজ কেউ ঘুমোয় নাকি? মার অশীতিপর মুখমণ্ডলে এক অপার্থিব হাসি, দাদা আমাকে বলছিল, 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' গাইতে। কী বুদ্ধি, বাসরে ওই গান চলে নাকি? আমি গাইব, 'ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে...।

' কী, ভালো হবে না? আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। না, এ কান্না নয়, অন্য এক অনুভূতি। এ এমনই এক বোধ, যা সুখ-দুঃখের অতীত। আমার যুক্তিবুদ্ধি বলছে লবণজল এখনও মার শরীরে ক্রিয়া শুরু করেনি। করলেই এ ঘোর ক্রমে কেটে যাবে। তখন আজকের সন্ধ্যাটা মার মনেও থাকবে না। কিন্তু হৃদয় যে অন্য কথা বলে। থাকবে। থাকবে। মার অবচেতনে। জীবন যত ফুরিয়ে আসছে, মৃত্যুর দিক থেকে ততই মুখ ফেরাতে চাইছে মা। সময়ের উজান স্রোতে ভাসছে।
শোকতাপ, বেদনা, মৃত্যু
_ সবই এখন মার কাছে চাপ চাপ অন্ধকার।
তার মাঝে শুধু ফুটে ওঠে কয়েকটা আলোর বিন্দু।
সুখের মুহূর্ত।
বিয়ে তো হলো,
এবার হয়তো এক্কা-দোক্কার দিনে ফিরবে মা।
পড়ন্তবেলায় এসব মুহূর্তগুলোই কি খোঁজে মানুষ?
একা একা!

The End